মিসাইলে মরো বা ক্যান্সারে

প্রদীপ দত্ত

ইরাকের মজুত গণবিধ্বংসী অস্ত্রই দেশটিকে আক্রমণ করার পক্ষে ইঙ্গ-মার্কিন মূল অজুহাত ছিল। গণবিধ্বংসী অস্ত্র বলতে বোঝানো হয় পরমাণু অস্ত্র, রাসায়নিক এবং জীবাণু অস্ত্র ও নিঃশেষিত depleted ইউরেনিয়ামে তৈরি অস্ত্র। রাষ্ট্রপুঞ্জের মূল অস্ত্র-পরীক্ষক হান্স ব্লিক্স ছিলেন রাসায়নিক, জীবাণু ও ব্যালিস্টিক অস্ত্র পরীক্ষার দায়িত্বপ্রাপ্ত। কয়েক বছর আগে ব্লিক্স ছিলেন আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি সংস্থার প্রধান। এখন তিনি এই সংস্থার প্রধান, সেই মহম্মদ এল বারাদেই ইরাকের পরমাণু অস্ত্র সন্ধানের দায়িত্বে ছিলেন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অভিযোগের তালিকায় ইরাকের রাসায়নিক ও জীবাণু অস্ত্র প্রাধান্য পেলেও কিছুদিন আগে পর্যন্ত কিন্তু ইরাকের পরমাণু অস্ত্র তৈরির উদ্যোগই ছিল পেন্টাগনের বেশি চিন্তা ও অভিযোগের বিষয়। তা না হলে আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি সংস্থার প্রাক্তন ও বর্তমান প্রধান দুই মুখ্য অস্ত্র পরীক্ষকের দায়িত্ব পাবার কথা না।

গণবিধ্বংসী অস্ত্রের মধ্যে ধ্বংস-ক্ষমতায় পরমাণু অস্ত্রের সাথে অন্য অস্ত্রের প্রায় তুলনাই হয় না। রাষ্ট্রপুঞ্জের পরমাণু অস্ত্রের মুখ্য পরীক্ষক এল বারাদেই পৃথিবীকে আশ্বস্ত করেছেন একথা শুনিয়ে যে ইরাকে পরমাণু অস্ত্র তৈরির প্রচেষ্টার বালাই বর্তমানে ছিল না।

এ বিষয়ে সাধারণ মানুষের ভুল ধারণা গড়ে ওঠার সূত্রপাত হয়েছিল নব্বইয়ের দশকের গোড়ায়। উপসাগরীয় সঙ্কট যখন যুদ্ধের দিকে এগোচ্ছে সে সময় আন্তর্জাতিক পরমাণু সংস্থার চুয়াল্লিশ জন পরীক্ষককে পরমাণু অস্ত্রের গুপ্ত নথি উদ্ধারের দায়ে বাগদাদের এক পার্কিং লটে ছিয়ানব্বই ঘণ্টা বন্দী করে রাখা হয়েছিল। বন্দী থাকাকালীন অবস্থায় এবং মুক্তি পাবার পর মুখ্য পরীক্ষক ডেভিড কে ও অন্যান্য পরীক্ষকেরা ইরাকের পরমাণু বোমা তৈরির প্রচেষ্টা সম্বন্ধে টেলিভিশন সাক্ষাৎকার দিয়েছিলেন। পরে ভিয়েনাতে আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি সংস্থার এক প্রেস কনফারেন্সে ডেভিড কে জানান যে এক থেকে দেড় বছরের মধ্যেই ইরাক পরমাণু বোমা তৈরি করে ফেলত। ওই সংস্থার তদানীন্তন প্রধান হান্স ব্লিক্স এবং অন্যান্য কর্তাব্যক্তিরা ইঙ্গিত দিয়েছিলেন যে ইরাক হাইড্রোজেন বোমা তৈরি করতে চলেছিল।

বিশেষজ্ঞরা কিন্তু ইরাকের হাইড্রোজেন বোমা তৈরির কথাকে গুত্ব দেন নি। ওয়াশিংটন পোস্টের এক নিবন্ধে বলা হয়েছিল যে নিরাপত্তা পরিষদ দীর্ঘকাল ধরে ইরাকের ওপর নজরদারি চালানোর জন্য একটি খসড়া প্রস্তাব আনতে চায়। সে কারণেই হাইড্রোজেন বোমা বানানোর প্রচেষ্টার কথা বানিয়ে বলা হয়েছে। অন্যদিকে ডেভিড কে অবশ্য জানিয়েছিলেন যে পরমাণু প্রযুক্তি সম্বন্ধেইরাকের জ্ঞান এমনই পর্যাপ্ত যে পরীক্ষা ক্রমাগত চালিয়ে না গেলেও মুখ থুবড়ে পড়া পরমাণু কর্মসূচি থেকেই তারা আবার উঠে দাঁড়াতে পারে।

একথা সত্যি যে আশির দশকের শেষে বিপুল পরিমাণ অর্থ ও সম্পদের সাহায্যে ইরাক গোপন পরমাণু প্রকল্প পেট্রোকেমিক্যাল থ্রি চালু করেছিল। যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম বোমা তৈরির সময়কার মানহাটান প্রকল্পের মতো ইরাকের পরমাণু প্রকল্পেও একইসাথে কয়েকটি ভিন্ন প্রযুক্তিগত রাস্তায় এগোনো শু হয়েছিল। কোন পথে যে তাদের ইপ্সিত সাফল্য আসবে তা অজানা ছিল বলেই তারা নানা সম্ভাব্য পথে বহু শত কোটি ডলার ব্যয় করে। বাগদাদের পঞ্চাশ কিলোমিটার দক্ষিণে আল অাথের-এ একটি পরমাণু কেন্দ্র নির্মিত হয়। বাগদাদের কুড়ি কিলোমিটার দক্ষিণপূর্বে আলতুয়াইথা-তে আগেই নির্মিত হয়েছিল ইরাকের জাতীয় পরমাণু গবেষণা কেন্দ্র। প্রয়োজনীয় বিশেষজ্ঞ এবং উন্নতমানের যন্ত্রপাতি পাঠিয়ে দেওয়া হয় আল আথিরে। তবে ১৯৯১ সালের গোড়ায় মার্কিন বিমান আক্রমণে যখন আল অাথের ধ্বংস হয় ইরাকের বিজ্ঞানীরা তখনও পরমাণু বোমার নক্সা তৈরি করে উঠতে পারেন নি। আল তুয়াইথাও সেই আক্রমণে ধ্বংস হয়েছিল।

সে সময় মার্কিন আক্রমণ না ঘটলে দু-তিন বছরের মধ্যেই হয়তো ইরাক একটি পরমাণু বোমা তৈরি করার মতো অতি সমৃদ্ধ ইউরেনিয়াম উৎপাদন করে ফেলত। নব্বইয়ের দশকের মাঝামাঝি হয়তো অল্প কয়েকটি বোমাও এসে যেত ইরাকের হাতে। কিন্তু তার বেশি নয় মোটেই। বিশেষজ্ঞদের মতে ইরাকের পরমাণু অস্ত্র কর্মসূচিকে যুক্তরাষ্ট্র ও রাষ্ট্রপুঞ্জের পক্ষ থেকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে দেখানোর কারণ হল গোপন পরমাণু অস্ত্র কর্মসূচির নানা কথা প্রকাশের জন্য যেন ইরাকের ওপর যথেষ্ট চাপ থাকে। যুক্তরাষ্ট্র ও রাষ্ট্রপুঞ্জ মনে করত যে ইরাকের খবর সংবাদপত্রের প্রথম পাতা থেকে সরে এলেই ইরাক আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি সংস্থাকে আর কোনও তথ্য জানাতে চাইবে না।

অবশ্য অতি সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে যা বলা হচ্ছিল তার উদ্দেশ্য আর ইরাকের ওপর চাপ-টাপ নয়। সরাসরি আক্রমণের ক্ষেত্র প্রস্তুত করা। সাম্প্রতিক অতীতে পরমাণু অস্ত্রের কথা আলোচনাতেও আসে নি। এখানে বলে রাখা ভালো যে একটি দেশ গোপনে কয়েকটি নিক্ষেপযোগ্য পরমাণু অস্ত্র তৈরি করে ফেলল, কাক-পক্ষীতে তা টের পেল না, বর্তমান পৃথিবীতে এমন ঘটনার সম্ভাবনা নেই বললেই হয়।

তবে অন্যদেশের চোখ এড়িয়ে রাসায়নিক ও জীবাণু অস্ত্র তৈরি ও মজুত করা সম্ভব। কথা হল, ইরাকের রাসায়নিক অস্ত্রের কথা যুক্তরাষ্ট্র এখন থেকে কুড়ি বছর আগেই জানত।

কীটনাশক সার, ওষুধ ও অন্যান্য বাণিজ্যিক দ্রব্য তৈরিতে ব্যবহৃত রাসায়নিক, বেশ কিছু রাসায়নিক অস্ত্র তৈরিতেও ব্যবহৃত হয়। নানা রাসায়নিক ফর্মূলাও সবদেশই জানে। সামান্য পরিবর্তন অথবা কোনও পরিবর্তন ছাড়াই বাণিজ্যিক কেন্দ্রে যুদ্ধে ব্যবহৃত রাসায়নিক উৎপাদন করা যায়। সে কারণেই এইসব রাসায়নিক উৎপাদনে নজরদারি রাখাও কঠিন।

১৯৯৭ সালে প্রকাশিত গোপন ইন্টেলিজেন্স রিপোর্ট অনুযায়ী ১৯৮৩ সাল থেকেই যুক্তরাষ্ট্র জানে যে ইরাকের রাসায়নিক অস্ত্র রয়েছে, তারা তা ব্যবহার করছে এবং এক বিদেশি সংস্থার সাহায্যে বড় রাসায়নিক অস্ত্র উৎপাদন কেন্দ্র গড়ে তুলছে। যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্র দেশ এরপরও ইরাককে ঋণ ও অন্যান্য সহযোগিতা চা

লিয়ে যায়। ইরাক-ইরান যুদ্ধে ইরাক অবাধে রাসায়নিক অস্ত্র ব্যবহার করেছে। পরে উত্তর ইরাকের কুর্দ অধ্যুষিত গ্রামেও তারা মাস্টার্ড ও নার্ভ গ্যাস প্রয়োগ করেছিল। সে সময় কোনও দেশ ইরাকের নিন্দায় এগিয়ে আসে নি। ইরাকি সৈন্যের বিদ্ধে এই অস্ত্র প্রয়োগের ফল হিসাবে ইরানও রাসায়নিক যুদ্ধের কর্মসূচি গ্রহণ করে। মার্কিন সরকার এবং পশ্চিমি মিত্রেরা তখন ইসলামিক ইরানকে সামলাতে সাদ্দাম হোসেনকে খুঁটি সাজায়। তাই সাদ্দামের রাসায়নিক অস্ত্রভাণ্ডারে রসদ জোগায় তারাই। নববইয়ের দশকের গোড়ায় উপসাগরীয় যুদ্ধে অবশ্য সমীকরণ বদলে যায়। সেই যুদ্ধে মার্কিন সৈন্যের বিদ্ধে ইরাক রাসায়নিক ও জৈবিক অস্ত্র ব্যবহার করে।

ইরাকের পরাজয়ের পর মার্কিন চাপে রাষ্ট্রপুঞ্জের বিশেষজ্ঞরা ইরাকের চার লক্ষ আশি হাজার লিটারের বেশি কেমিক্যাল এজেন্ট এবং আঠারো লক্ষ লিটার 'প্রিকারসর কেমিক্যাল' নষ্ট করে ফেলে। সে সময় রাষ্ট্রপুঞ্জের বিশেষ কমিশনের প্রধান রল্ফএকাস নিউইয়র্ক টাইমস-কে এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছিলেন যে ইরাকের মজুত যাবতীয় বিপজ্জনক রাসায়নিকের খোঁজ পাওয়া গেছে বলে তিনি মনে করেন না। ১৯৯৫ সালে যুক্তরাষ্ট্রের ডিফেন্স ইন্টেলিজেন্স এজেন্সির মূল্যায়ন ছিল ইরাক রাসায়নিক অস্ত্রের গবেষণা ও উন্নয়ন চালিয়ে যাচ্ছে। উৎপাদন যন্ত্রও তৈরি রেখেছে। তাতে যেকোনও সময়ে উৎপাদন শু করতে পারে। অর্থাৎ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দীর্ঘকাল ধরেই জানত যে প্রয়োজন মনে করলে ইরাক রাসায়নিক অস্ত্র ব্যবহার করতে পারে।

তবে ১৯৯৭ সালে যুক্তরাষ্ট্রের ডিফেন্স ইন্টেলিজেন্স এজেন্সির সূত্রে এও জানা গিয়েছিল যে আমেরিকা ও রাশিয়া ছাড়া পৃথিবীর কুড়িটি দেশের ভাণ্ডারে রাসায়নিক ও জৈবিক অস্ত্র রয়েছে। এই দেশগুলো হল—ইজিপ্ট, ইজরায়েল, সিরিয়া, ইরান, ইরাক, লিবিয়া, সৌদি আরব, উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়া, রোমানিয়া, ইউগোস্লাভিয়া, পূর্বতন চেকোস্লোভাকিয়া, বুলগেরিয়া, ফ্রান্স, ভারত, পাকিস্তান, চীন, তাইওয়ান,বর্মা এবং ভিয়েতনাম। ইরাক ছাড়া এইসব দেশের মধ্যে যারা দুর্বল তারা এখনও যুক্তরাষ্ট্রের আক্রমণের লক্ষ্য হয়নি। সৌভাগ্য, মাটির নীচে ইরাকের মতো মহার্ঘ্য তেল মজুত নেই।

সন্ত্রাসবাদী আল কায়দার আশ্রয় ও মদতদাতা আফগানিস্তানকে গুঁড়িয়ে দিয়েছিল যুক্তরাষ্ট্র। সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠী রাসায়নিক ও জীবানু অস্ত্রের জোগানদার হয়ে উঠতে পারে এই অজুহাতে ইরাককে ধ্বংসস্তুপে পরিণত করল ইঙ্গ-মার্কিন শক্তি। সবচেয়ে চিন্তার কথা হল মার্কিন দাদাগিরি এখানেই থেমে থাকবে না।

আরও দুঃশ্চিন্তা ও উদ্বেগের কারণ রয়েছে। ইদানীং কালের সব যুদ্ধে ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনী বোমা, ক্ষেপণাস্ত্র এবং গুলি-গোলায় নিঃশেষিত ইউরেনিয়াম (depleted uranium)-এর ব্যবহার করছে। সুদূরপ্রসারী প্রভাবে ইরাকি সাধারণ মানুষ, সৈন্যবাহিনী অচিরেই ক্যান্সারসহ অন্যান্য নানা জটিল রোগে আক্রান্ত হবে। বাপারটা একটু ব্যাখ্যা করে বলা যাক।

পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদন কিংবা বোমা তৈরির উদ্দেশ্যে ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণের (enrichment) পর যে নিচুমাত্রার তেজস্ক্রিয় ইউরেনিয়াম উপজাত পদার্থ হিসাবে পড়ে থাকে তাকেই নিঃশেষিত ইউরেনিয়াম বলে। ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধ করে ইউরেনিয়াম ২৩৫ সমস্থানিকের পরিমাণ বাড়িয়ে তা পরমাণু চুল্লির অথবা পরমাণু বোমার বিভাজনক্ষম জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা হয়। প্রাকৃতিক ইউরেনিয়ামের শতকরা ৯৯.৮ ভাগই হল অবিভাজনক্ষম ইউরেনিয়াম ২৩৮। ফলে সমৃদ্ধ ইউরেনিয়াম ২৩৫ পেতে গেলে বিপুল পরিমাণ ইউরেনিয়াম ২৩৮ বর্জ্যপদার্থ হিসেবে পড়ে থাকে। বর্তমান পৃথিবীতে এই নিঃশেষিত ইউরেনিয়ামের পরিমাণ বারো লক্ষ টনের বেশি। আমেরিকাতেই মজুত রয়েছে সাত লক্ষ টন। এক দিকে এই পরিমাণ বেড়েই চলেছে, অথচ এই তেজস্ক্রিয় বর্জ্যপদার্থ কিভাবে নিরাপদে সংরক্ষণ করা যায় তা নিয়ে বিতর্কের সমাধান আজও হয়নি।

নিঃশেষিত ইউরেনিয়ামের ভর খুবই বেশি। স্টিলের চেয়ে তা আড়াইগুণ ভারি। টাংস্টেনের চেয়ে তা অনেক বেশি শক্ত। সে কারণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অস্ত্র তৈরি করতে এর কদর খুবই। যুদ্ধাস্ত্র তৈরি করতে যুক্তরাষ্ট্র টাংস্টেন আমদানি করে। অথচ বিনামূল্যে নিজের দেশেই পাওয়া যায় নিঃশেষিত ইউরেনিয়াম, যার নিরাপদ সংরক্ষণ নিয়ে সমস্যা। এ দিয়ে যুদ্ধাস্ত্র তৈরি করা হলে অস্ত্র প্রয়োগের মাধ্যমে তা চালান হয়ে যায় শত্রুদেশে।

নিঃশেষিত ইউরেনিয়ামে তৈরি গোলা সেকেন্ডে ৫০০০ মিটার গতিতে ছুটে যেতে পারে। এই গতি সাধারণ বুলেটের চারগুণ। একমাত্র নিঃশেষিত ইউরেনিয়ামের চাদরের বর্মে ঢাকা ট্যাঙ্ক কিংবা সাঁজোয়া গাড়িই সে গোলা যুঝতে সক্ষম। যেমন আমেরিকার এম১এ১। সেকারণেই ১৯৯২ সালে মার্কিন কংগ্রেস সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে নতুন অ্যাব্রাম (Abram) ট্যাঙ্কের চাদরের বর্ম হিসাবে নিঃশেষিত ইউরেনিয়াম ব্যবহার দ্বিগুণ করা হবে। ক্ষেপনাস্ত্রের ওজনের ভারসাম্য রাখতেও নিঃশেষিত ইউরেনিয়াম ব্যবহার করা হয়। তাই নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে ইরাকের ধ্বংসের আমরা যে ছবি দেখেছি তা-ই শেষ কথা নয়। দেশটি কম মাত্রার তেজস্ক্রিয় ইউরেনিয়ামে দূষিত হয়েছে ব্যাপকভাবে। এর সূদূরপ্রসারী ফল হল বোমা, ক্ষেপণাস্ত্র, গুলি-গোলা যেখানে পড়েছে সেখানে বসবাসকারী সাধারণ মানুষ ভবিষ্যতে তেজস্ক্রিয়তা জনিত দুরারোগ্য ব্যধিতে ভুগবে।

ইউরেনিয়াম এক্সাইডের ধুলোয় যেসব সাধারণ মানুষ ও প্রাক্তন সেনা আক্রান্ত হয়েছেন তাতে রয়েছে নানা ধরনের ইউরেনিয়াম অক্সাইড। এদের নানান ভৌত এবং জৈব রাসায়নিক ধর্ম রয়েছে। এইসব ইউরেনিয়াম অক্সাইড রাসায়নিকভাবে বিষাক্ত এবং তেজস্ক্রিয়। এদের কয়েকটি দ্রবণীয়, কয়েকটি অদ্রবণীয়। বেশিরভাগ দ্রবণীয় অক্সাইড শরীর থেকে দ্রুত বেরিয়ে যায়। তাসত্ত্বেও তারা শরীরের পক্ষে খুবই বিপজ্জনক। যে অক্সাইড দ্রবণীয় নয় তাদের সাথে গ্রহণ করলে শরীরে দীর্ঘস্থায়ী সমস্যার সৃষ্টি হয়। দ্রবণীয় অক্সাইড শরীরে জটিল রাসায়নিক দূষণ ঘটায়। তাতে মূলত কিডনি আক্রান্ত হয়। অদ্রবণীয় অক্সাইডের তেজস্ক্রিয় দূষণে মূলত আক্রান্ত হয় ফুসফুস।

উপসাগরীয় যুদ্ধের প্রাক্তন সেনাদের মধ্যে কিডনীর ক্যান্সারও দেখা গেছে। ইউনিভার্সিটি অব সান্ডারল্যান্ডের মেডিক্যাল কেমিস্ট ম্যালকম হুপার উপসাগরীয় যুদ্ধ ফেরৎ ব্রিটিশ সেনাদের চিকিৎসার পরামর্শদাতা। তাঁর মতে ব্রিটিশ সরকার এখনও পর্যন্ত যে তিন হাজার উপসাগরীয় যুদ্ধ ফেরৎ সেনার স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেছে তার মধ্যে তিন জনের কিডনির ক্যান্সার ধরা পড়েছে। সাধারণ ব্রিটিশ নাগরিকের তুলনায় তা বারো গুণ বেশি। তা থেকে ধারণা হয় যে তেজস্ক্রিয়তা ছাড়া শরীরের ক্ষেত্রে নিঃশেষিত ইউরেনিয়ামের রাসায়নিক কুপ্রভাবও কম নয়।

নিঃশেষিত ইউরেনিয়ামের বিপদের কথা আরও আগেই জানা গিয়েছিল। ১৯৯২ সালে ব্রিটিশ অ্যাটমিক এনার্জি কমিশনের প্রতিবেদনে বলা হয় যে উপসাগরীয় যুদ্ধক্ষেত্রে নানা মাপের নিষ্কাশিত ইউরেনিয়াম ছড়িয়ে পড়বে, ইউরেনিয়ামের গুঁড়ো থেকে শু করে ছোট বড় যন্ত্রাংশ ও অব্যবহৃত গোলাবাদ পড়ে থাকে যুদ্ধের পর। স্থানীয় মানুষ যদি ব্যবহৃত যুদ্ধাস্ত্রের অংশবিশেষ সংগ্রহ করে রেখে দেয় তাহলে তা দুশ্চিন্তার কারণ। যেসব এলাকায় বেশ কয়েক রাউন্ড নিঃশেষিত ইউরেনিয়ামে তৈরি গোলাগুলি ছোঁড়া হয়েছে সেখানকার পরিবেশ এতটাই দূষিত হয়ে পড়বে যে স্থানীয় মানুষ ও সাফাইকর্মীদের পক্ষে তা খুবই বিপজ্জনক হতে পারে।

এক জার্মান ডাক্তার সিগওয়ার্ট হর্স্ট গুন্থার ১৯৯২ সালের জুলাই মাসে জানান যে তিনি অন্তত বারোটি ছেলেমেয়েকে এই তেজস্ক্রিয় অস্ত্রের টুকরো নিয়ে খেলা করতে দেখেছেন, তাঁর ধারণা এই তেজস্ক্রিয় সামরিক জঞ্জালই ইরাকের শিশুদের লিউকোমিয়া ও অন্য নানা ধরনের ক্যান্সার রোগ বৃদ্ধির কারণ।

১৯৯৩ সালে যুক্তরাষ্ট্রের জেনারেল অ্যাকাউন্টিং অফিস উপসাগরীয় যুদ্ধে যারা অংশগ্রহণ করেছিলেন সেই মার্কিন সেনাদের মধ্যে তেজস্ক্রিয়তার প্রভাব নিয়ে একটি প্রাথমিক প্রতিবেদন পেশ করে। সেখানে স্বীকার করা হয় যে কয়েক ডজন মার্কিন সেনা উপসাগরীয় যুদ্ধে কম মাত্রায় তেজস্ক্রিয় বিকিরণের শিকার

হয়েছেন।
একই সময় মার্কিন প্রতিরক্ষা দফতর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সেনাদের রোগভোগকে অবহেলা করে বলেছে—এ হল তাদের মাথার রোগ। সামরিক ডাক্তাররা সেনাদের মানসিক পরীক্ষা করে পেশির বিশ্রামের ওষুধ ও ঘুমের বড়ি খাবার উপদেশ দিয়েছে। অথচ ১৯৯১ সালের অপারেশন মঝড়ে অংশগ্রহণকারী সেনাদের মধ্যে দু'হাজার জনের মৃত্যু ঘটেছে ১৯৯৩ সালের মধ্যে।
যুদ্ধাস্ত্রে ব্যবহৃত নিঃশেষিত ইউরেনিয়ামের ক্ষতিকর প্রভাব বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম গুত্বপূর্ণ প্রতিবেদন প্রকাশিত হয় ১৯৯৪ সালের এপ্রিল মাঝে। "মেডিক্যাল অ্যান্ড এনভায়রন-মেন্টাল ইভ্যালুয়েশন অব ডি ইউ (ইউ এস এ)" শিরোনামে। মার্কিন স্থলসেনা, নৌসেনা ও বায়ুসেনা বাহিনীর অফিসারদের নিয়ে গঠিত একটি দল প্রতিবেদনটি তৈরি করে। সেখানে বলা হয় যুদ্ধের সময় যে অঞ্চলে ব্যাপকভাবে নিঃশেষিত ইউরেনিয়ামে তৈরি অস্ত্র ব্যবহার করা হবে সেখানে নিশ্বাসের সাথে খাবারের সাথে ও অন্যান্যভাবে শরীরে নিঃশেষিত ইউরেনিয়াম যৌগ স্থানীয় মানুষের শরীরে মিশবে।
আরও বলা হয় যে সেনাবাহিনীর জন্য নিরাপত্তার পন্থা অবলম্বন করা এবং তাদের সুরক্ষার জন্য বিশেষ পোষাক ব্যবহার করা দরকার যাতে নিঃশেষিত ইউরেনিয়ামের প্রভাব যথাসম্ভব কমানো যায়।
এরপর ১৯৯৪ সালের জুলাই মাসে ইউ এস আর্মি এনভায়রমেন্টাল পলিসি ইনস্টিটিউট জানিয়েছিল যে নিঃশেষিত ইউরেনিয়াম যদি শরীরে প্রবেশ করে তাহলে মানুষের স্বাস্থ্যে তার উদ্বেগজনক প্রভাব ফেলার ক্ষমতা রয়েছে। নিঃশেষিত ইউরেনিয়ামের ঝুঁকি যেমন রাসায়নিক, তেমনি তেজস্ক্রিয় বিকিরণ সম্বন্ধীয়ও। কোনও সাঁজোয়া গাড়ি যদি নিঃশেষিত ইউরেনিয়ামের গোলাগুলিতে আক্রান্ত হয় তাহলে সেই গাড়ির মধ্যে এবং কাছাকাছি যারা থাকবে তাদের শরীরে যথেষ্ট পরিমাণ তেজস্ক্রিয় কণা প্রবেশ করার সম্ভাবনা রয়েছে।
১৯৯৭ সালে ইউনাইটেড নেশনস কমিশন অন হিউম্যান রাইটস গণহত্যার অস্ত্র হিসাবে নিঃশেষিত ইউরেনিয়ামে তৈরি অস্ত্রের ব্যবহারের নিন্দা করে বলে।
পারমাণবিক, রাসায়নিক, জৈবিক এবং নিঃশেষিত ইউরেনিয়ামে তৈরি অস্ত্র মূলগতভাবে বাছবিচারহীন। এর প্রভাবও সীমিত থাকে না। যুদ্ধ শেষ হয়ে যাবার দীর্ঘদিন পরেও এর অবশিষ্ট প্রভাব থেকেই যায়। যুদ্ধে নিঃশেষিত ইউরেনিয়াম ব্যবহারের দীর্ঘদিন পরও তা মৃত্যু, জটিল অসুস্থতা, নানা ধরনের প্রতিবন্ধীর জন্ম ও জন্মগত ত্রুটির কারণ হতে পারে। মাটিতে পানীয় জল সরবরাহ এবং পরিবেশে তা যুগের পর যুগ ধরে থেকে যায়। ফলে পানীয় জল এবং চাষযোগ্য জমি অব্যবহার্য হয়ে পড়ে।
মার্কিন হানাদারিতে ইরাকের ধ্বংসের যে চিত্র দেখে আমরা ভয়ে আঁতকে উঠেছি, নিন্দায় সরব হয়েছি তার আড়ালে রয়েছে আরও ভয়াবহ ভবিষ্যতের অপেক্ষা। সেকথা মাথায় রাখা প্রয়োজন। মানবতার, পৃথিবীর শত্রু ইঙ্গ-মার্কিন জোটের আগ্রাসন থামানো তাই খুবই জরি।
১৯৯১ সালের উপসাগরীয় যুদ্ধে মার্কিন নেতৃত্বে মিত্রশক্তি কুয়েত ও দক্ষিণ ইরাকে অন্তত ৪০ টন নিঃশেষিত ইউরেনিয়াম রেখে এসেছে, যুদ্ধের ইতিহাসে সেই প্রথম (অপারেশন মঝড়ে) মার্কিন ও ব্রিটিশ সেনারা নিঃশেষিত ইউরেনিয়ামে তৈরি গোলাবাদ, ট্যাঙ্কে ও ক্ষেপণাস্ত্রের ব্যাপক ব্যবহার করে। নিঃশেষিত ইউরেনিয়ামের চাদর দিয়ে তৈরি দশটি অ্যাব্রাম ট্যাঙ্ক ও পনেরটি সাঁজোয়া গাড়ি নিজেদের গোলাগুলির আঘাতেই ভস্মীভূত হয়। যাকে বলে 'ফ্রেন্ডলি ফায়ার'। তার ফলে তেজস্ক্রিয় ইউরেনিয়াম অস্ত্রের দূষণে সেখানকার বাতাস-জল-মাটি দূষিত হয়।
১৯৯২ সালের জুলাই মাসে এক জার্মান ডাক্তার মিগওয়ার্টইর্স্ট জানান যে তিনি অন্তত বারোটি ছেলে-মেয়েকে তেজস্ক্রিয় টুকরো নিয়ে খেলা করতে দেখেছেন। তার ধারণা তেজস্ক্রিয় সামরিক জঞ্জালই ইরাকের শিশুদের লিউকোমিয়া এবং অন্য নানা ধরনের রোগ বৃদ্ধির কারণ।
১৯৯৪ সালে ইরাকি সোসাইটি ফর এনভারনমেন্টাল অ্যান্ড ইমপ্রুভমেন্টের তত্ত্বাবধানে ৩১৭ জন ইরাকি ডাক্তার এক সমীক্ষা করেন। তাঁদের তৈরি সমীক্ষা প্রতিবেদনে নিঃশেষিত ইউরেনিয়ামের প্রভাবে ইরাকে বন্ধ্যাত্ব, জন্মগত ত্রুটি, লিউকোমিয়া, বাত, হাঁপানি, ব্রঙ্কাইটিস, ফুসফুসের ক্যান্সার, শ্রবণহীনতা, টিউমার ও রক্তের জটিল অসুখের বৃদ্ধির কথা বলা হয়।
১৯৯৮ সালের ২৮ জানুয়ারি ইরাকের স্বাস্থ্যমন্ত্রক কুয়েত ও সৌদি আরবের সীমান্ত অঞ্চলের জেলা মুথান্নাতে লিউকোমিয়া রোগ বৃদ্ধির কথা বলে। ১৯৮৯ সাল থেকে ১৯৯৫ সালের মধ্যে এই রোগ শতকরা ৩.৮ থেকে বেড়ে হয়েছে ১০.৬ শতাংশ। স্বাস্থ্যমন্ত্রক ১৯৯১ সালের যুদ্ধপরবর্তী সময়ে শিশুদের মধ্যে এই রোগের বিশেষ বৃদ্ধির কথা বলে।
১৯৯১ ইরাকের যুদ্ধ, পরে ইউগোস্লোভিয়া, আফগানিস্তান এবং সাম্প্রতিক ইরাক যুদ্ধে ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনী যুদ্ধাস্ত্রে নিঃশেষিত ইউরেনিয়াম ব্যবহার করেই চলেছে। এই যুদ্ধে নিজেদের বাহিনীকে নিঃশেষিত ইউরেনিয়ামের প্রভাব থেকে বাঁচাতে কয়েকটি পদক্ষেপ তারা নিয়েছিল। কিন্তু এর আগে নিজেদের সেনাবাহিনীও এর ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষা পায় নি। নিঃশেষিত ইউরেনিয়াম নিয়ে শেষ সোরগোল পড়েছিল বছর দুয়েক আগে। ইতালির ছ'জন সেনার লিউকোমিয়ায় মৃত্যুর সংবাদে 'বালকান সিনড্রোম' নিয়ে দুঃশ্চিন্তা শু হয়। এরপর ইউগোস্লোভিয়ার কর্মরত শান্তিরক্ষী বাহিনীর তিরিশজন ইতালীয় সেনার গুতর অসুস্থতার সাথে নিঃশেষিত ইউরেনিয়ামের সম্পর্কের সম্ভাব্যতা নিয়ে ইতালি তদন্ত শু করে। তিরিশজনের মধ্যে বারোজনই ক্যান্সারে ভূগছিল। ২০০১ সালের জানুয়ারি মাসের গোড়ায় সপ্তম সেনা লিউকোমিয়ায় আক্রান্ত হয়ে মারা যায়। ইতালির বক্তব্য, ইউগোস্লোভিয়ার যেসব অঞ্চলে ন্যাটো নিক্ষিপ্ত অস্ত্রে নিঃশেষিত ইউরেনিয়াম ব্যবহৃত হয়েছে, সেখানে কিভাবে নিজেদের রক্ষা করতে হয় সেসব ভালো করে জেনে নিয়েই মার্কিন সেনারা সেখানে গিয়েছিল। অন্যদিকে ইতালীর সেনারা সে বিষয়ে অন্ধকারেই ছিল।
জানুয়ারি মাসের পাঁচ তারিখের ইউরোপিয়ান কমিশনের প্রেসিডেন্ট রোমানো প্রদি ন্যাটো ব্যবহৃত অস্ত্রে নিঃশেষিত ইউরোনিয়ামের ব্যবহারই বালকান শান্তিরক্ষী বাহিনীর মধ্যে মৃত্যু ও অসুস্থতার কারণ কিনা জানতে চেয়েছিলেন। ইতালী রেডিওতে তিনি বলেন "একথা পরিষ্কার যে সৈনিকদের ঝুঁকি রয়েছে। অস্ত্রশস্ত্র থেকে যদি তাদের ছিটেফোঁটা ঝুঁকিও থাকে তাহলেও তার ব্যবহার বন্ধ করা দরকার।"
এরপর ইতালির অনুরোধে বিষয়টি ন্যাটোতে আলোচিত হয়। ইতালির প্রধানমন্ত্রী বলেন যে অস্ত্রশস্ত্র থেকে মিত্রশক্তি বাহিনীর স্বাস্থ্যের কোনও ঝুঁকি নেই সেকথা তিনি বিশ্বাস করেন না। তিনি আরও বলেন "অবস্থা খুবই জটিল। এতদিন জানতাম কসোভোতে নিঃশেষিত ইউরোনিয়াম ব্যবহৃত হয়েছে, বসনিয়ায় হয়নি। এতদিন বলা হয়েছে ওই ধরনের ইউরেনিয়াম বিশেষ পরিস্থিতিতেই বিপদের। যেমন, যে হাতে ক্ষত রয়েছে সেই হাতে যদি নিঃশেষিত ইউরেনিয়ামের টুকরো তোলা হয় তাহলে তেজস্ক্রিয়তার শিকার হতে হবে। কিন্তু সাধারণ অবস্থায় তা কখনই বিপজ্জনক নয়। এখন আমাদের মনে হয়, ব্যাপার মোটেই এত সাদামাটা নয়।"
একে একে ইউরোপের বেশ কয়েকটি দেশ এ বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করলে ন্যাটো 'বলকান সিনড্রোম' নিয়ে তদন্ত শু করতে বাধ্য হয়।
জার্মান চ্যান্সেলর গেরহার্ড শ্রয়ডার সাংবাদিকদের বলেন "এই ধরনের গোলাবাদ কোথায় কোথায় ব্যবহৃত হচ্ছে এবং তার ফলাফল কি সে বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ তদন্ত চাই। এই অস্ত্র ব্যবহারের সাথে অসুস্থতার সম্পর্ক আছে কিনা তাও আমরা জানতে চাই।"
স্পেন জানায় যে ১৯৯২ সাল থেকে বলকানে তাদের যে বত্রিশ হাজার সৈন্য কর্মরত ছিল তাদের সবারই স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হবে। দু হাজার সালের সেপ্টেম্বর মাসে বেলজিয়ামের বিশিষ্ট দৈনিক 'দে মরগেন'-এ প্রকাশিত হয় যে তাদের সতেরো হাজার সৈন্যের শতকরা পনেরো থেকে কুড়ি শতাংশ সেনা ত্রোয়েশিয়া, বসনিয়

া, হারজেগোভিনা, কসোভো ইত্যাদি অঞ্চলে শান্তিরক্ষার দায়িত্বে ছিল। তারাই আজ নানান গুতর অসুস্থতায় ভুগছে। এভাবে বেলজিয়ামের চারজন ও দুজন ডাচ সৈনিক লিউকোমিয়ায় মারা গেছে। একসময় বলকান অঞ্চলে কর্মরত ফ্রান্সের চারজন সৈনিক লিউকোমিয়ায় আক্রান্ত হবার পর ফ্রান্সও এ নিয়ে তদন্তের নির্দেশ দেয়। এরপর পর্তুগাল, ফিনল্যান্ড, নরওয়ে, জার্মানি, সুইজারল্যান্ড, তুরস্ক, বুলগেরিয়া, পোল্যান্ড এবং গ্রিস তাদের সেনাদের পরীক্ষা করে। দেখে যে সেনারা বলকান সিনড্রোমে আক্রান্ত কিনা।

ইউ এন এনভায়রনমেন্ট প্রোগ্রামের পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে জানানো হয় যে দুহাজার সালের নভেম্বর মাসে কসোভোর এগারেটি স্থানে পরীক্ষা করে আটটি জ ায়গায় কিছু পরিমাণ তেজস্ক্রিয় বিকিরণের অস্তিত্ব ধরা পড়ে।

১৯৯৯ সালে কসোভো আক্রমণের সময় মার্কিন গ্রাউন্ড অ্যাটাক এয়ারক্রাফট এ-১০ থান্ডারবোল্টস সাবিয়ান ট্যাঙ্ক ও সাঁজোয়া গাড়ির উদ্দেশ্যে একত্রিশ হাজার র াউন্ড ৩০ মিলিমিটার নিঃশেষিত ইউরেনিয়ামে তৈরি গুলি ছোঁড়ে—যাতে ছিল মোট সাড়ে নয় টন নিঃশেষিত ইউরেনিয়াম। ন্যাটো রোমকে জানায় যে বসনিয়ার বিদ্ধেও এই নিষিদ্ধ ধাতু ব্যবহার করা হয়েছে। ১৯৯৪-৯৫ সালে বসনিয়ার সারাজেভোর আশপাশে দশ হাজার রাউন্ড গুলি ছোঁড়া হয়। ইতালির শান্তিরক্ষী বা হিনী যে অঞ্চলে কাজ করেছে কসোভোর সেই অঞ্চলে ছোঁড়া হয়েছে চোদ্দ হাজার রাউন্ডের বেশি ওই ধাতুর তৈরি গুলি। বেলগ্রেডসহ অন্যান্য শহরের লক্ষ্যস্থলেও এই ধাতু নির্মিত অস্ত্র নিক্ষেপ করা হয়েছে।

দুহাজার সালে ইউগোস্লোভিয়ার শান্তি সেনাদের রোগভোগ ও মৃত্যু নিয়ে যে অভিযোগ, ১৯৯১ সালের উপসাগরীয় যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সেনাদের বক্তব্যও ছিল একই। নিঃশেষিত ইউরেনিয়াম তৈরি অস্ত্রের বিপদ সম্বন্ধে তাদের আগে থেকে কিছুই বলা হয়নি। ফলে বহু মার্কিন সেনার শরীরে তেজস্ক্রিয় দূষণের নানা লক্ষণ দেখা দেয়। যেমন লিউকোমিয়া, কিডনি ও লিভারের কঠিন অসুখ, শরীরের প্রতিরোধী ব্যবহার ক্ষতি, সন্তান জন্ম দেওয়ার অক্ষমতা ইত্যাদি।

ইউগোস্লোভিয়ার যুদ্ধে সেদেশের সাধারণ মানুষ ছাড়াও বিভিন্ন দেশের শান্তিসেনারা নিঃশেষিত ইউরেনিয়ামের প্রভাবে একইভাবে আক্রান্ত হয়। অথচ এর সম্ভাব্য ক্ষতিকর প্রভাব সম্বন্ধে ব্রিটিশ ও মার্কিন প্রতিরক্ষা মন্ত্রক দীর্ঘদিন ধরেই ওয়াকিবহাল ছিল। ১৯৯১ সালের পর থেকেই নানা সময় এর বিপদ সম্বন্ধে নানা বিভাগীয় সমীক্ষার সাবধান করে দেওয়া হয়েছে।

যে অঞ্চলে নিঃশেষিত ইউরেনিয়াম অথবা অন্য সূত্রে তেজস্ক্রিয়তার বিপদ থাকে সে জায়গাকে লো লেভেল রেজিয়েশন (এল এল আর) হ্যাজার্ড এরিয়া বলা হয়। মার্কিন সামরিক বাহিনীর ফিল্ড ম্যানুয়াল ৩-১৪ নিউক্লিয়ার বায়োলজিক্যাল অ্যান্ড কেমিক্যাল (এন বি সি) ভালনারেবিলিটি অ্যানালিসিস (জুলাই ১৯৯৬)-এ বলা হয়েছে

কেমিক্যাল ও মেডিক্যাল অফিসারসহ প্রয়োজনীয় স্টাফ অফিসারদের অবশ্যই অভিযানের আগে কমান্ডারদের এল এল আর হ্যাজার্ড এরিয়া সম্বন্ধে সঠিক উপদেশ দিতে হবে। মানুষের স্বাস্থ্যের ওপর এল এল আর-এর গুতর ও দীর্ঘকালীন প্রভাব সম্বন্ধে কমান্ডারদের অবশ্যই জানাতে হবে। যেসব ইউনিটের যথাযথ যন্ত্রপাতি, উপযুক্ত লোকবল ও যথাযথ প্রশিক্ষণ নেই তাদের এল এল আর পরিবেশে কোনও অভিযানে যাওয়া উচিত নয়।

১৯৯৬ সালের আগস্ট মাসে প্রকাশিত অ্যালাইড কমান্ড ডিরেকটিভে একই কথা বলা হয়। সম্প্রতি ইঙ্গ-মার্কিন হানাদারির ফলে ইরাকে ধবংসের যে চিত্র দেখে অ ামরা ভয়ে আঁতকে উঠেছি, নিন্দায় সরব হয়েছি তার আড়ালে রয়েছে আরও ভয়াবহ ভবিষ্যতের অপেক্ষা। সেকথাও মাথায় রাখা প্রয়োজন। শত্রু ইঙ্গ-মার্কিন জে াটকে এখনই নিরস্ত্র করা খুবই জরি। কেননা একের পর এক দেশকে শুধু ধবংসই নয়, যুদ্ধোপকরণে নিঃশেষিত ইউরেনিয়াম ব্যবহার করে পরাজিত দুর্বল দেশগুলোর আগামী প্রজন্মকেও তারা বিকলাঙ্গ তেজস্ক্রিয়তার বিষে জর্জরিত করে তুলছে।

Reference

১. David Albright and Mark Hibbs, Iraq's bomb : Blue prints and artifacts, pp-30-40 the bulletin of the Atomic Scientist. Jan/Feb, 1992.

২. E J Hogendooru, A chemical weapons atlas, PP 35-39 the Bulletin of the Atomic Scientists, Sept/oct 1997.

৩. Amy E. Smithson, chemical wcapon : The end of the begining, the bulletin of the Atomic Scientists, Oct. 1992, P 36-39

৪. Jonathan B Tucker & Amy Sands, An unlikely threat, PP 46-52 Bulletin of the Atomic Scientists, July/Aug 1999.

৫. Depleted uranium proliferation, p.3, World Information Services on Energy (WISE) News Communique, No. 403, 3 December, 1993

৬. A reseanch guide for desert storw syndrome, p.6, WISE News Communique April 3, 1998

৮. Depleted uranium seen as waste in France, P. 14, WISE News Communique, No 497, September 11, 1998.

৯. BBC News, 4 & 5 January 2001

১০. The Independent, 4 January 2001

১১. The Guardian 8 January 2001

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com